আশীষ লাহিড়ী

# ঈশ্বর-অক্ষয় : অনন্য এক অন্যোন্যজীবিতা

বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) আর অক্ষয়কুমারের (১৮২০-১৮৮৬) জন্ম একই বছরে। একজনের জন্ম হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে, অন্যজনের অল্পশিক্ষিত হিন্দু কায়স্থ ঘরে। যে-অপরিসীম দারিদ্র্য সহ্য করতে হয়েছিল শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে, অক্ষয়কুমারকে তা হয়নি, যদিও তাঁকে প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। আরেকটা বড়ো অমিল এই যে অভিভাবকের অতি-সজাগ অভিনিবেশ একেবারে শিশুকাল থেকে বিদ্যাসাগরের কেরিয়ার নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল; অপরদিকে অভিভাবকদের উদাসীনতায় অক্ষয়কুমারের জীবনের অনেকগুলি বছর নষ্ট হয়েছিল। তবে এর সুফলও ফলেছিল। খানাকুল-কৃষ্ণনগর পণ্ডিতসমাজের অন্তর্গত কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র একেবারে শৈশব থেকেই একমুখী সংস্কৃত শিক্ষার পরিমণ্ডলে বড়ো হন। ইংরেজি, পাশ্চাত্য দর্শন প্রভৃতি শেখেন নিজের তাগিদে, পরে। অর্থাৎ সংস্কৃত শিক্ষায় চর্চিত তৈরি-জমিতে পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বীজ ছড়িয়েছিলেন পরিণত বিদ্যাসাগর। অপরদিকে, উদাসীন অভিভাবকদের কল্যাণে অক্ষয়কুমারের ঐরকম কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। খানিকটা এলোমেলোভাবে হলেও অল্প বয়স থেকেই ইংরেজি সাহিত্য, অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষা, আধুনিক গণিত, বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চার ফলে নানা বিষয় নিয়ে open-ended বিদ্যাচর্চায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন তিনি। ছোটোবেলায় কিছু সংস্কৃত ও ফার্সি শিখলেও, ভালো করে সংস্কৃত শেখেন বেশ বড়ো বয়সে। ততদিনে আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনে ভিত গাঁথা হয়ে গেছে তাঁর। অর্থাৎ পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী শিক্ষায় ও আধুনিক বিজ্ঞানে চর্চিত মন নিয়ে সংস্কৃত দর্শন ও সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেছিলেন পরিণত অক্ষয়কুমার। যেন দুই পাহাড়চূড়া থেকে যাত্রা শুরু করে একই উপত্যকায় এসে মিললেন দুই ভাবনির্ঝর।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিতেন সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তি থাকিলে বাঙ্গালা ভাষার গঠন বিষয়ে কেহই সহায়তা করিতে পারে না। একজন লোককে তিনি খুব সুখ্যাতি করিতেন, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত।' কৃষ্ণকমল অবশ্য বিদ্যাসাগরের এই প্রশংসাকে 'damning with faint praise' বলে সমালোচনা করেছেন। কেননা বিদ্যাসাগর 'বলিতেন—"অক্ষয় লিখ্‌তে টিখ্‌তে বেশ পারে, আমি দেখে শুনে দি, অনেক জায়গায় লিখে সংশোধন করে দিতে হয়।" কিন্তু আমার [কৃষ্ণকমলের] মনে হয় না যে, অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরের সংশোধনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। দু'জনের style, ভাব, লিখিবার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।'[১] অন্যত্র আরো পরিষ্কার করে অক্ষয়কুমারের রচনার মূল্যায়ন করেছেন কৃষ্ণকমল : 'অক্ষয় দত্তের বাঙ্গালা রচনাতে ঈশ্বর গুপ্তের নিকট হাতে খড়ি হয়। তবে অক্ষয় দত্ত যে বরাবর গুরুর রচনাপদ্ধতি নকল করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি অনেকটা বিদ্যাসাগরি রীতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া বিদ্যাসাগরেরও মাছিমারা নকল করেন নাই। অক্ষয় দত্ত যেরূপ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, তিনি যে কাহারও নকলে চলিবেন,

ইহা কোনোমতেই সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার রচনার ঔদার্য, ওজস্বিতা, অকপট আন্তরিকতা, এবং মনের ভাব অকাতরে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা বাঙ্গালার অতি অল্প লোকেই প্রদর্শন করিয়াছেন।'[২]

পরবর্তীকালের গবেষকদের মূল্যায়নের পাল্লা কৃষ্ণকমলের দিকেই ভারী। 'বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম যুগে যে দুই জন শিল্পীর সাধনায় বাংলা ভাষা সাহিত্য-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাঁহাদের এক জন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অন্য জন অক্ষয়কুমার দত্ত। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরেজি সাহিত্য-পুস্তককে আদর্শ করিয়া যে-কার্য করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার ইংরেজি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থের আদর্শে ঠিক সেই কার্যই সাধিত করিয়া গিয়াছেন। ... যত দিন বাংলা ভাষা জীবিত থাকিবে, তত দিন ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারকে স্মরণ রাখিতে হইবে।'[৩] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিশ্লেষণের মধ্যে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের ভূমিকার নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অক্ষয়কুমারের হাতেই বাংলা *বিজ্ঞান-সাহিত্যের* জন্ম ও সাবালাকত্ব লাভ।

চল্লিশের দশকে বিদ্যাসাগরের গদ্য, বিশেষত বৈজ্ঞানিক বিষয়ের গদ্য, তখনও নিজস্ব গৌরবের মধ্যগগনে পৌঁছয়নি। ১৮৪৮-এ প্রকাশিত তাঁর *জীবন-চরিত* গ্রন্থই তার প্রমাণ। ঐ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে বিদ্যাসাগর তা স্বীকারও করেছেন : 'মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত দুর্বোধ ও অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল এবং স্থানে স্থানে ভাষার রীতিরও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।' দ্বিতীয় সংস্করণে বক্তব্য 'সুস্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত বিস্তর পরিশ্রম' করলেও তিনি জানাচ্ছেন, 'তথাপি আদ্যোপান্ত সুস্পষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য হইয়াছে কোনো মতেই সম্ভাবিত নহে।' এই পরিপ্রেক্ষিতে সুকুমার সেনের বক্তব্য : 'অক্ষয়কুমারই প্রথম ভারতীয় ব্যক্তি যিনি বিজ্ঞান চর্চায় ও গবেষণায় কিছু মন দিয়েছিলেন। ... অক্ষয়কুমার দত্তের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পূর্ণমাত্রায় বৈজ্ঞানিক এবং তাঁর ঋজু ও পরিতি বাক্‌রীতি সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপজাত। তাঁর রচনারীতিতে লাবণ্য নাই কিন্তু দৃঢ়তা, ঋজুতা ও ব্যবহারযোগ্যতা আছে। বৈজ্ঞানিকের উপযুক্ত ভাষা অক্ষয়কুমারই বাংলায় প্রথম দেখিয়ে গেছেন।'[৪]

## তত্ত্ব-বিসংবাদ

তত্ত্ববোধিনী সভা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় ৬ অক্টোবর ১৮৩৯। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মধর্ম প্রচার। 'কিন্তু শুধু যদি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার অথবা বেদান্ত আলোচনা তত্ত্ববোধিনী সভা-র কাজ হত, তাহলে ১৮৩৯ সালে মাত্র দশজন সভ্য নিয়ে যে সভা স্থাপিত হয়েছিল, সেই সভার সভ্যসংখ্যা ১৮৪১-৪২ সালের মধ্যে ৫০০ পর্যন্ত হত না। আরও কয়েক বছরের মধ্যে তত্ত্ববোধিনীর সভ্যসংখ্যা ৮০০ পর্যন্ত হয়। তত্ত্ববোধিনীতে ধর্মতত্ত্বের আলোচনারও বিশেষত্ব ছিল, গোঁড়ামির কোনো সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকত না। তা থাকলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের মতো বেদ-বেদান্ত বা যে-কোনো শাস্ত্রীয় বচনের অভ্রান্ততায় অবিশ্বাসী ব্যক্তির স্থান হত না সভায়।'[৫]

এই শেষ বাক্যটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্ববোধিনী সভায় প্রথম থেকেই দুটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারার সংঘাত ছিল। একদিকে ছিল বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী যুক্তিবাদ-বিরোধী ভাবনাচিন্তা, অন্যদিকে

'বেদ-বেদান্ত বা যে-কোনো শাস্ত্রীয় বচনের অভ্রান্ততায় অবিশ্বাসী' আধুনিক বিজ্ঞান-পন্থী ভাবধারা; দ্বিতীয় ভাবধারার বর্শামুখ ছিলেন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় কী লেখা ছাপা হবে তা নির্বাচন করার জন্য একটি 'পেপার কমিটি' গঠন করা হয়েছিল। তখনকার অনেক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এর সদস্য ছিলেন : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীধর ন্যায়রত্ন, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাধাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও অক্ষয়কুমার দত্ত।

১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫—এই বারো বছর অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন। এই বারোটি বছর বাঙালির মননচর্চার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত। তিনটি কারণে তাঁর এই কীর্তি বিশেষভাবে স্মরণীয় : এক, তিনি শিক্ষিত বাঙালির চিন্তাভাবনায় একটা আরোহবাদী যুক্তিশীলতার বাতাবরণ তৈরি করেন। দুই, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত ও প্রচুর লেখা লেখেন (পাঠ্যবই সমেত) এবং ঐ ধরনের লেখার উপযোগী সরল মনোগ্রাহী গদ্য-কাঠামো রচনা করে নেন। তিন, স্পষ্ট ভাষায় বেদের অভ্রান্ততাকে চ্যালেন্‌জ করেন। খুচরো খুচরো করে এ ধরনের কথা আরও কেউ কেউ হয়তো বলেছিলেন। কিন্তু একটা সুসংহত, কেন্দ্রীয় দার্শনিক তত্ত্বের পরিকাঠামোয়, চিন্তাধারার একটা 'সিস্টেম' হিসেবে একটা আধুনিক বিজ্ঞানদর্শনকে উপস্থাপন করার ব্যাপারে অক্ষয়কুমার পথপ্রদর্শক।

এই পর্বে অক্ষয়কুমার মানুষের ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক দিকগুলি সম্বন্ধে সচেতনভাবেই কম কথা বলতেন। সেগুলোকে রেখে দিতেন নেপথ্যে। মানুষের সঙ্গে ঐহিক বাহ্য জগতের সম্বন্ধ কী, সেটাই ছিল তাঁর মূল আলোচ্য; পরম সত্তার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী, তা নিয়ে তিনি বিশেষ ভাবিত ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক এর বিপরীত। তিনি বাহ্য জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে ততটুকুই আগ্রহী ছিলেন, যতটুকু সেই পরম সত্তার উপাসনায় সহায়ক। দেবেন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তি তো অনেকেরই জানা : 'আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ; —আকাশ পাতাল প্রভেদ।'

খানিকটা স্পিনোজার ধরনে অক্ষয়কুমার প্রকৃতি আর প্রকৃতির ঈশ্বরের ধারণাটি গড়ে তোলেন। ঈশ্বর মানে হল, প্রকৃতির নিয়মগুলির অলঙ্ঘনীয় পরস্পর-নির্ভরতা। তাই ঈশ্বরের পাঠ সবচেয়ে ভালোভাবে নেওয়া যায় এই ব্রহ্মাণ্ডকে জেনে। তিনি একথাও বলেন যে ভারতীয় মনীষা যে বৈজ্ঞানিক ভাবনার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড আশা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত ঈপ্সিত প্রগতি ঘটাতে পারেনি, তার একটি বড়ো কারণ হল, এই ব্রহ্মাণ্ডকে তন্ন তন্ন করে জানবার আগ্রহের অভাব। এই ব্রহ্মাণ্ড কোন্ কোন্ কারণে অবাস্তব তার প্রমাণ সন্ধানেই তাঁদের বেশির ভাগ সময় নষ্ট হয়েছে। কী করলে এই জঘন্য মনুষ্যজন্ম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তার উপায় সন্ধানে তাঁরা অনেকে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে কী করলে, বিদ্যাসাগরের ভাষায়, পৃথিবীটাকেই স্বর্গ করে ফেলা যায় তা নিয়ে ভাববার অবকাশ পাননি।

ঠিক এই জায়গাতেই ফ্রান্সিস বেকন তাঁর আরোহবাদী পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন নিয়ে অক্ষয়কুমারের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠলেন। বেকনীয় পন্থার মূল কথাটি এই : বিজ্ঞানের কাজ হল নিয়ম প্রণয়ন করা; এর জন্য প্রতীত ঘটনাসমূহকে পর্যবেক্ষণের মারফত তার পূর্ণ

বিবরণ জানতে হবে; কোন্ কোন্ জায়গায় ঘটনাগুলি একে অপরের থেকে আলাদা তা জানতে হবে; কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ঘটনাগুলি ঘটছে না, তা লক্ষ্য করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় যা জানা যাবে তার সত্যমিথ্যা যাচাই করার জন্য অতঃপর পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হবে। অভিজ্ঞতাবাদ (এম্পিরিসিজ়ম) ও আরোহবাদের (ইন্ডাক্‌টিভিজ়ম) সমন্বয়ে গঠিত এই পন্থাই ইউরোপে বিজ্ঞানের নবজন্ম ঘটায়। খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব-কবলিত মধ্যযুগ থেকে বেরিয়ে এসে বিজ্ঞান আধুনিক রূপ ধারণ করে ইউরোপে। এই প্রক্রিয়াটা ভারতবর্ষে ঘটেনি। ঘটেনি বলেই ভারতীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি দশম শতাব্দ থেকে মন্দীভূত হতে থাকে। গোতমের ন্যায়শাস্ত্রে আরোহ-প্রণালীর কিছু পূর্বাভাস থাকলেও, প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দু ধর্মতত্ত্বের প্রবল প্রকোপে পরে তা শুকিয়ে যায়। বৈশেষিকের ভাষ্যকারেরা প্রাণপণে ঈশ্বরের সঙ্গে বৈশেষিক দর্শনের সম্বন্ধ রচনায় উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। ১২০০ সালের পর থেকে নব্যন্যায় বলে যা গড়ে ওঠে তা বাস্তব অনুসন্ধানের পথ থেকে ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালি মনকে আরো বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। কাজেই যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে টাইকো, কেপলার, গালিলিও, নিউটনের উদ্ভব হয়, তার কোনো চিহ্ন দেখা গেল না ভারতবর্ষে। প্রায় ন-শো বছর পর সেই প্রক্রিয়া জাগিয়ে তোলার আন্দোলনে নামলেন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার—বিশেষ করে অক্ষয়কুমার। ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ঘটনা স্মরণীয় বলে মনে করি।

বেকনের তিনশো বছর পরে জন্মানোর সুবাদে অক্ষয়কুমারের কতকগুলো স্বাভাবিক সুবিধে ছিল। বেকনের চিন্তাধারার প্রধান দুর্বলতা এই যে তিনি গণিত ভালো বুঝতেন না, কী করে গাণিতিক পদ্ধতিতে সামান্যীকরণ ঘটিয়ে তত্ত্বে উপনীত হতে হয়, সে বিষয়ে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট ছিল। অপর দিকে দেকার্ত ছিলেন গণিতের জাদুকর। বেকন আর দেকার্ত এই দুজনে মিলে আধুনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিতন্ত্র গড়ে দেন। তারই পরিণতি দেখতে পাই নিউটনে। অক্ষয়কুমার যেহেতু গণিতে পারদর্শী, তাই বেকনের চিন্তাধারার দুর্বলতাটুকু তাঁকে স্পর্শ করেনি, তিনি বেকনের ইতিবাচক দিকটির দ্বারাই কেবল প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বেকনের আরো একটি ভাবনা অক্ষয়কুমারকে বিশেষ করে প্রভাবিত করেছিল। সেটি হল, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। 'মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান থেকে আধুনিক বিজ্ঞানে উত্তরণের পথে বাঁক ফেরার সন্ধিলগ্নে' বেকনের আবির্ভাব। আধুনিক বিজ্ঞানের 'মূলগত ব্যবহারিক চরিত্রটির ওপর এবং বিভিন্ন ব্যবহারিক কৌশলের উন্নতিসাধনের কাজে এর প্রয়োগ ঘটানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন' তিনি, জোর দিয়েছিলেন 'চারপাশের বাস্তব দুনিয়াটাকে সহজ কাণ্ডজ্ঞানের নিরিখে বুঝে নেওয়ার কাজে এই নতুন আন্দোলনের ভূমিকার ওপরে।' কিন্তু শুধু ব্যবহারিক উপযোগিতা নয়, প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা হিসেবেও তিনি এই নতুন বিজ্ঞানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন : '...তবে সবার চাইতে বড়ো উপকারটি সাধন করবেন তিনিই যিনি নিছক একটা কাজের জিনিস আবিষ্কার না করে প্রকৃতিতে একটা আলো জ্বেলে দিতে পারবেন। সেই আলোর স্পর্শে আমাদের বর্তমান জ্ঞানের গণ্ডির পরপারে স্থিত অন্ধকার এলাকাগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, অচিরেই বিশ্বের লুকোনো গোপন রহস্যগুলি আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। যিনি এ কর্মটি সাধন করবেন তিনি মানবজাতির মঙ্গলবিধাতা রূপে কীর্তিত হবেন, পূজিত হবেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে

মানুষের সাম্রাজ্যবিস্তারকারী রূপে, মানবমুক্তির হোতা রূপে, জীবনযাপনের উপকরণসমূহের বিজেতা বলে।'[৬] বেকনের এই কথার প্রতিধ্বনি অক্ষয়কুমারের বহু রচনায় বহু বার শুনতে পাই আমরা। তিনি যখন বলেন, ব্রহ্মের চেয়ে ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেই তাঁর আগ্রহ বেশি, তখন আসলে তিনি বেকনের পথেই হাঁটেন।

সিদ্ধার্থ ঘোষ মন্তব্য করেছিলেন, 'বেকনের দর্শনের প্রতি রামমোহনের ... আস্থা সত্ত্বেও অক্ষয়কুমার দত্তকেই আমরা বেকনের আদর্শের প্রথম বাঙালি প্রচারক বলতে পারি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ভারতের এখন একজন বেকন প্রয়োজন। ... ১৮৫৫ সালে অক্ষয়কুমারের সম্পাদকের চাকরিটি হারানোর পিছনেও রয়েছে বেকনীয় আসক্তি।'[৭] এই প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমারের নিজের উক্তিটি (যদিও অনেক পরের) এই :

> প্রাচীন ভারতের দার্শনিক গ্রন্থকারেরা অনেকেই সতেজ বুদ্ধির সুপুষ্ট বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি তত্ত্বানুসন্ধানের প্রকৃত পন্থাবলম্বন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-মার্গে বিচরণ করিতে পারিতেন, তবে বহুকাল পূর্ব্ব ভারত ভূমিও ইয়ুরোপ-ভূমির ন্যায় এ অংশে ভূস্বর্গ-পদে অধিরূঢ় হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা বিশ্বের যথার্থ প্রকৃতি ও সেই প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নিরূপণের নিশ্চিত উপায় চেষ্টা না করিয়া কেবল আপনাদের অনুধ্যান-বলে দুই একটি প্রকৃত মতের সহিত অনেকগুলি মনঃকল্পিত মত উদ্‌ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের একটি পথ-প্রদর্শকের অভাব ছিল। একটি বেকন্—একটি বেকন্—একটি বেকন্—তাঁহাদের আবশ্যক হইয়াছিল।[৮]

অক্ষয়কুমার খুব ভালোভাবেই জানতেন যে বেকন-চর্চার আবশ্যিকতার কথা বলে তিনি ভীমরুলের চাকে ঘা মেরেছেন। রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে একবার লিখেছিলেন তিনি : 'ঈশ্বর গুপ্ত আমার সম্বন্ধে একবার শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন "বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত"।'[৯]

সিদ্ধার্থ আরেকটি প্রায়-অলক্ষিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সেটি হল, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে অক্ষয়কুমারের সম্ভাব্য প্রভাব। 'রামমোহন থেকে শুধু অক্ষয়কুমার নয়, রাজেন্দ্রলাল পর্যন্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক আছে। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত রাজেন্দ্রলাল তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভার সদস্য রূপে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে কাজ করেছেন। ঠিক তার পরেই, ১৮৫১-য় রাজেন্দ্রলাল বিবিধার্থ-সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।' রাজেন্দ্রলাল-সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র বেকনীয় আদর্শ সম্বন্ধে যদি-বা কোনো সন্দেহ থাকে, 'চতুর্থ পর্বে প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জ্ঞানশিক্ষার বিষয়' আমাদের সন্দেহ নিরসন করল। ইংরাজি উপ-শিরোনামা ছিল 'Baconian System of Philosophy'.[১০]

এই বেকনের মাটিতেই খুঁটি পুঁতেছিলেন বিদ্যাসাগরও। একদিকে বৈদান্তিক মায়াবাদ ও অধঃপতিত সাংখ্যদর্শন, অন্যদিকে জর্জ বার্কলির ভাববাদী দর্শন, এই সবগুলির বিরুদ্ধে একযোগে লড়াই করেছিলেন তিনি। ১৮৫৩ সালে জে আর ব্যালান্টাইনের সঙ্গে তাঁর মহাবিতর্ক বাঙালির মননচর্চার ও বিজ্ঞানদর্শনচর্চার ইতিহাসে এক অমূল্য দলিল। বিদ্যাসাগর বেকনীয় অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের আলোকে বিচার করে অধঃপতিত সাংখ্য ও বেদান্তকে 'false systems of philosophy' বলে চিহ্নিত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু কেন 'ফল্‌স' তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন নি। তাঁর অত সময়

ছিল না। সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, পুস্তক রচনা, পরে মেট্রোপলিটান শিক্ষাকাণ্ড, নানাবিধ জনহিতকর কাজে তিনি ব্যবহারিক দিক থেকে এত ব্যস্ত থাকতেন যে এই তাত্ত্বিক কাজ করবার অবসর তাঁর ছিল না। তা সত্ত্বেও, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে যেটুকু সমালোচনী মনোভাব তিনি দেখিয়েছিলেন তারই 'পাপে' এদেশের পণ্ডিতমহল আজও তাঁকে ক্ষমা করতে পারেননি।

## অক্ষয়কুমারের মত-বিবর্তন ও বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর মশাই যে কাজ অসমাপ্ত রেখেছিলেন, সেই কাজ নিয়েই সারা জীবন কাটান অক্ষয়কুমার। অধঃপতিত সাংখ্য ও বেদান্ত কেন 'ফল্‌স', বিজ্ঞান ও দর্শনের তুলনামূলক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলে ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের মূল্যায়ন কী হবে, তার বিস্তৃত টীকাভাষ্য রচনা করেন তিনি—অকুতোভয়ে, পরিণামের কথা না ভেবে। বিদ্যাসাগরের অল্প কয়েকটি বিধ্বংসী উক্তিই (তাও ইংরেজি ভাষায়!) যদি হিন্দু বাঙালিদের কোমল প্রাণে এত আঘাত দিয়ে থাকে, তাহলে অক্ষয়কুমারের স্বদেশি ভাষার কামানগর্জন যে তাদের একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী।

'তত্ত্ববোধিনী সভায় এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পেপার-কমিটিতে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার এই দুজনের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ ও মতবিরোধ হতে থাকে। ... মতামতের দিক থেকে অক্ষয়কুমারের প্রধান সমর্থক ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ... দেবেন্দ্রগোষ্ঠী ও অক্ষয়গোষ্ঠীর মতামতের সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে তত্ত্ববোধিনীর যুগে শিক্ষিত বাঙালির মননক্ষেত্র প্রসারিত হতে থাকে।'[১১]

তবে এই সংঘর্ষ কেবল দেবেন্দ্রগোষ্ঠীর সঙ্গেই নয়, যাবতীয় অযৌক্তিক আধ্যাত্মিক ও সামাজিক, এমনকি রাজনৈতিক আচরণের সঙ্গেই। স্বয়ং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও প্রকাশ্য বিরোধিতায় নামতে কসুর করেন নি অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে তার বিবরণ পাই। 'ইংরেজি ১৮৫৪/৫৫ খ্রিস্টাব্দে (১৭৭৬/৭৭ শকে) সিভেস্টিপুল নগরের নিকট ভয়ানক যুদ্ধ হয়। তৎকালে ইংরেজদের জয়-কামনার জন্য ইংলণ্ডের অনেক গির্জাতে প্রার্থনা হয়। ঐ উপলক্ষে ভারতবর্ষের গির্জা সকলেও তদনুরূপ প্রার্থনা করিবার আদেশ আইসে। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের একটি অধিবেশনে হিন্দু পেট্রিয়ট-সম্পাদক বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ সমাজে অনুরূপ প্রার্থনা করিবার একটি প্রস্তাব করেন। কিন্তু আপনি ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করাতে তাহা রহিত হইয়া যায়।'[১২]

এই সংঘর্ষের নানা কৌতূহলজনক চিত্র পাওয়া যায়। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের এক বক্তৃতায় তিনি একবার বলেন :

> ভাস্কর ও আর্য্যভট এবং নিউটন ও লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র; গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কোঁত যে-কোনো প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র।[১৩]

এঁদের মধ্যে লাপ্লাস ও কোঁত দু'জনেই ছিলেন প্রসিদ্ধ নিরীশ্বরবাদী। তাই অক্ষয়কুমারের বক্তৃতাটি তত্ত্ববোধিনীতে ছাপার সময়ে এ দুটি নাম চুপিসাড়ে বাদ দেওয়া হয়।

অক্ষয়কুমারের চিন্তাধারার বিকাশে কয়েকটি স্তর দেখতে পাই। প্রথম পর্যায়ে, যখন তিনি জর্জ কুম-এর ভাবধারায় নিমগ্ন, তিনি মনে করছেন, প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে জানতে পারলে প্রগতি ঘটবে। সেই সব প্রাকৃতিক নিয়মাবলী সর্বব্যাপ্ত এবং সর্বশক্তিমান একজন ঈশ্বরের অস্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেননা সেই ঈশ্বরই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখেন। দুই, ঈশ্বরই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখেন ঠিকই, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মকানুন আমাদের জানতে হবে এই ঐহিক বিশ্বপ্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেই। অর্থাৎ, জ্ঞান আহরণের কাজে শাস্ত্রচর্চা কিংবা ধর্মচর্চা গৌণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই মুখ্য। স্পষ্টতই, ডীইজ়ম-এর দ্বারা তিনি এই পর্বে গভীরভাবে প্রভাবিত। এর ফলে নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে এক সমস্যার উদয় হল। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মকানুনের মধ্যে মানুষের জন্য যদি নৈতিক কোনো নির্দেশ না থাকে, তাহলে মানুষের আচরণের ভালোমন্দের মাপকাঠিটা কী হবে, সমাজ এগোবে কী করে? অক্ষয়কুমার যেসময় এইসব ভাবনাচিন্তা করছেন, ঠিক সেই সময়েই (১৮৫৯) বেরোয় ডারউইনের *অরিজিন অব স্পিশিজ়*। একদিকে তা জীববিজ্ঞানে যেমন মুক্তির হিল্লোল বহিয়ে দিল, অন্যদিকে তেমনি, সমাজবিজ্ঞানে 'সামাজিক ডারউইনবাদী'দের অশুভ প্রভাব মানুষে মানুষে শোষণকে 'প্রকৃতিসম্মত' বলে প্রমাণ করতে চাইল। এই ভুল পথে হেঁটে শিব ভেবে বাঁদর গড়ে ফেলার একটা বিপদ ছিল। অক্ষয়কুমার সেই ভুল রাস্তায় হাঁটেন নি। তার বদলে তিনি বেকনীয় দর্শনের কাঠামোর মধ্যেই নিজেকে ধরে রাখেন। আর সেই কাঠামোরই অঙ্গ স্বরূপ জন স্টুয়ার্ট মিলের যুক্তিশাস্ত্র আয়ত্ত করে নেন। এক্ষেত্রেও তাঁর মনন-সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি রীতিমতো লড়াই করে বিশপ বার্কলি-র ভাববাদী দর্শনকে (যাকে তিনি শঙ্করের মায়াবাদের বিলিতি ভাষ্য মনে করতেন) বাতিল করে মিলের 'লজিক' আর বেকনের *Novum Organum*-কে সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যক্রমে সন্নিবিষ্ট করেন। সুতরাং অক্ষয়কুমার সিদ্ধান্তে এলেন, মানুষকে এমন এক প্রস্থ মূল্যবোধ তৈরি করতে হবে, যা হবে বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মাবলির সঙ্গে সুসঙ্গত। সমাজজীবনে মানুষের সুস্থভাবে বাঁচবার জন্য যেসব জিনিস চাই, মানুষের যেসব চাহিদা ভৌত এবং জৈব বিজ্ঞানের নিয়মগুলির সঙ্গে সঙ্গত, তারই আলোকে মানুষের নৈতিক আচরণের ভালোমন্দের সংহিতা বানিয়ে নিতে হবে।

এইসব বিভিন্ন ভাবধারার সংঘাতে শেষ পর্যন্ত অক্ষয়কুমারের বিশ্বভাবনায় আমূল পরিবর্তন এসেছিল। পৌত্তলিকতা তিনি ইস্কুলে পড়বার সময়েই বর্জন করেছিলেন। কিন্তু ডীইজ়মে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ডীইস্ট্‌রা মনে করতেন, একেবারে সৃজনের আদিলগ্নে ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক মোক্ষম ঠেলা দিয়ে সরে পড়েছেন। ব্রহ্মাণ্ড তার পর থেকে নিজের নিয়মেই চলেছে, আর ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ দরকার হচ্ছে না। দেবেন্দ্র-জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্তী যে-যে কারণে অক্ষয়কুমারকে সমালোচনা করেছেন, তার একটি হল তাঁর ডীইজ়ম-আসক্তি। অন্যটি, যা কার্যত একই সূত্রে জড়িত, হল এই যে তিনি আঠেরো শতকের ফরাসি *আঁসিক্লোপেদি*-গোষ্ঠীর মতানুসারী। ১৭৫১ থেকে ১৭৭২-এর মধ্যে তাঁরা আটাশ খণ্ডে প্রকাশ করেন 'জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রকৌশল ও পদার্থসমূহের বিশ্বকোষ' যা পৃথিবীর ইতিহাসের একটি মহত্তম ঘটনা। প্রধানত দনি দিদরো (Denis Diderot, ১৭১৩-৮৪) এবং দলাঁবেয়ার (D'Alembert, ১৭১৭-৮৩)-এর প্রযত্নে রচিত এই যুগান্তকারী বিশ্বকোষে 'মুক্ত মননের সঙ্গে বিজ্ঞান, ম্যানুফ্যাকচার ও অবাধ বাণিজ্যের ভাবনার মিলন ঘটল ... গ্রন্থটি হয়ে উঠল নবীন উদারপন্থীদের বাইবেল।'[১৪] ডীইজ়ম

সম্পর্কে দিদরো-র মন্তব্য অমর হয়ে রয়েছে : ডীইস্ট হচ্ছে সে-ই ব্যক্তি যে নাস্তিক হয়ে উঠবার আগেই মারা গেছে!

বয়স ও জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়কুমার সম্ভবত আরো চরমপন্থী অবস্থান নেন। অনুমান করা যায়, ডারউইনের অরিজিন তাঁর চিন্তার দিক-বদলে এক মাইলফলক হয়ে রয়েছে। নইলে তাঁর মহাগ্রন্থ *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে* কেন পাতার পাতা জুড়ে প্রমাণ করতে চাইবেন যে হিন্দু ধর্মের বনেদ বলে কথিত 'ষড়্দর্শনের মধ্যে প্রায় কোনো দর্শনকারই জগতের স্বতঃ-সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করেন নাই। কপিল-কৃত সাংখ্য তো সুস্পষ্ট নাস্তিকতাবাদ; পতঞ্জলি ঈশ্বরের অঙ্গীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিশ্বস্রষ্টা না বলিয়া বিশ্ব-নির্মাতা মাত্র বলিয়া গিয়াছেন। গোতম ও কণাদের মতানুসারে জড় পরমাণু নিত্য; কাহারও কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। প্রাচীন মীমাংসাপণ্ডিতেরা তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তের মতে জগৎ সৃষ্টই হয় নাই, বিশ্বব্যাপার ভ্রমমাত্র, ইহাতে আর সৃষ্টিকর্তার সম্ভাবনা কি?'[১৫] 'জগতের যাবতীয় পদার্থ মূল প্রকৃতিরই কার্য্য-পরম্পরা মাত্র'—সাংখ্যের এই মত ব্যক্ত করে তিনি একটি পাদটীকায় বলেন :

> অধুনাতন বিজ্ঞানবিৎ সর্বপ্রধান ইয়োরোপীয় পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মত The Theory of Evolution কিয়দংশে কি এই সাংখ্য-মতের অনুরূপ বোধ হয় না? তাঁহারা বলেন, যেমন শূককীট রূপান্তরিত হইয়া প্রজাপতি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এক বস্তু ও এক প্রাণী পরিণত হইয়া অন্য বস্তু ও প্রাণী উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে। কপিল ঋষি তাঁহাদের ঐ মতের একটি সঙ্কুচিত অঙ্কুর রোপণ করিয়া গিয়াছেন একথা বলিলে কি বলা যায় না?[১৬]

আস্তিক বেকন-এর পাশাপাশি তিনি নিজেকে নাস্তিক কোঁত-এরও ভক্ত বলে ঘোষণা করেন। তাই অক্ষয়-সুহৃদ ও সমালোচক রাজনারায়ণ বসু স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছিলেন, 'The Babu long ago abjured his belief in Brahmoism and turned an agnostic. This change can be proved from passages in his work on Hindu sects.'[১৭]

*ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে* চার্বাক দর্শন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবার সময় অক্ষয়কুমার 'সর্বদর্শনসংগ্রহে'র কোন্ সংস্করণ ব্যবহার করেছিলেন তা উল্লেখ করেননি, কিন্তু এরকম অনুমান করতে হয়তো বাধা নেই যে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ১৮৫৩-১৮৫৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত নতুন সংস্করণটিই তাঁর হাতের সামনে ছিল। 'বইটি নিজের উদ্যোগে সম্পাদনা করেন বিদ্যাসাগর। তার থেকেই লোকে—এদেশে ও বিদেশে—প্রাচীন ভারতের আপসহীন নিরীশ্বরবাদী বেদবিরোধী এই [চার্বাক] দর্শনের কথা জানতে পারেন। ... সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকার সময়ে (১৮৫১-১৮৫৮), নানা কাজের মধ্যে বিদ্যাসাগর এই দামি কাজটিও করেছিলেন।' শুধু তাই নয়, 'কালীমতীদেবী ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-র প্রথম বিধবা বিবাহ' আয়োজনের সমস্ত 'ঝামেলার মধ্যেই' তিনি সে-কাজটি সম্পন্ন করেন।[১৮] 'এই বইটি দিয়েই আধুনিক বিশ্বে চার্বাকচর্চার সূত্রপাত। এতেই প্রথম বেশ কয়েকটি চার্বাকসূত্রর উল্লেখ আছে (যদিও অবিকল উদ্ধৃতি নয়)।'[১৯] *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের* দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকায় গুরুত্বসহকারে চার্বাকসূত্রের উদ্ধৃতিদানের ঘটনাটি বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের তাত্ত্বিক অন্যোন্যজীবিতার আরো একটি নিদর্শন।

বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের নিক্ষিপ্ত তীর যে ঠিক লক্ষ্যেই বিঁধত, তার অভ্রান্ততম প্রমাণ পাওয়া যায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বহুপঠিত চিঠিতে : 'কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে। ইহাদিগকে এই পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।' এই পরিপ্রেক্ষিতে অক্ষয়কুমার নিজেই তত্ত্ববোধিনী ছেড়ে দেন, না তাঁকে বহিষ্কার করা হয়, তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে অতিসূক্ষ্ম বিতর্ক চলে। নকুড় বিশ্বাস লিখেছেন : 'পীড়া ও অন্য কোনো কারণবশতঃ অক্ষয়বাবু তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণেচ্ছু হন।'[২০] এই অন্য কোনো কারণটি কী তা অনুমান করতে খুব কষ্ট হয় না।

### দুর্দিনের বন্ধু বিদ্যাসাগর

তখন বিদ্যাসাগর মশাই সরকারের সদ্যোস্থাপিত শিক্ষক-শিক্ষণ ('নর্মাল') স্কুলের অধ্যক্ষ রূপে অক্ষয়কুমারের নাম প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবে তিনি বলেছিলেন, ইনি ইংরেজি যথেষ্ট ভালো জানেন, এবং বাংলা ভাষায় এঁর চেয়ে কুশলী গদ্যকার ও নানা বিষয়ে এত জ্ঞানী ব্যক্তি এখন আর কেউ নেই। এ পদের জন্য ইনিই যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু নিজস্ব লেখাপড়ার ব্যাঘাত হবে বলে অক্ষয়কুমার তিনশো টাকা মাইনের এ পদ গ্রহণে একেবারেই রাজি ছিলেন না। অক্ষয়-জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি বলছেন, বিদ্যাসাগরকে সে আপত্তির কথা জানিয়েও দেন অক্ষয় দত্ত। কিন্তু ততদিনে বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব সরকারি স্তরে গৃহীত হয়ে গেছে। ঐ পর্যায় থেকে সে-প্রস্তাব ফিরিয়ে নিতে হলে বিদ্যাসাগরকে রীতিমতো হেনস্থা হতে হবে। অগত্যা অক্ষয়কুমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের সম্মানার্থে ঐ পদে যোগ দেন।[২১] এরকম ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। এর আগেও বিদ্যাসাগর শিক্ষা-বিভাগের সহ-পরিদর্শক পদের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করেছিলেন। বেতন ছিল দেড়শো টাকা। অক্ষয়কুমার তখন তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক রূপে ষাট টাকা মাইনে পান। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বিদ্যাসাগরের ঐ প্রস্তাবে না বলেছিলেন। কারণ ঐ ধরনের প্রশাসনিক কাজে যোগ দিলে তিনি নিজের পড়াশোনা করার যথেষ্ট সময় পাবেন না।

এবারে অবশ্য তাঁকে নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ পদে যোগ দিতেই হল। কিন্তু কাজে যোগ দিয়েই সাংঘাতিক 'শিরঃপীড়ায়' আক্রান্ত হলেন তিনি। অজ্ঞান হয়ে যান বারবার। মাসের পর মাস তাঁকে ছুটিতে থাকতে হয়। অবশেষে অগাস্ট ১৮৫৮-য় তিনি পাকাপাকিভাবে সে-কাজ ছেড়ে দেন। তার আগেই তাঁকে তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। অসুস্থ অক্ষয়কুমারকে এই বৃত্তি দানের উদ্যোক্তাও ছিলেন বিদ্যাসাগর। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেই যে অক্ষয়কুমার রোগ বাধিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করে প্রস্তাব পাঠ করেন বিদ্যাসাগর :

> ... তিনি যে অতি বিষম শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহা কেবল ঐ অত্যুৎকট মানসিক পরিশ্রমের পরিণাম, তাহার সন্দেহ নাই। ... অদ্য সমাগত সভ্যেরা নির্দ্ধারিত করিলেন, অক্ষয়কুমার বাবু যত দিন পর্য্যন্ত সম্যক সুস্থ ও স্বচ্ছন্দশরীর হইয়া পুনরায় পরিশ্রমক্ষম না হন, তত দিন তিনি সভা হইতে আগামী আশ্বিন মাস অবধি পঞ্চবিংশতি মুদ্রা মাসিক বৃত্তি পাইবেন।[২২]

১৬/৯/১৮৫৭ থেকে বৃত্তিদান শুরু হয়। অগাস্ট ১৮৫৮-য় অক্ষয়কুমার সরকারিভাবে পদত্যাগ করেন। ১৮৬২-তে জানান, আর বৃত্তির প্রয়োজন নেই, যেহেতু তাঁর বইয়ের বিক্রি যথেষ্ট বেড়েছে।

সব মিলিয়ে, শারীরিক কষ্টের কথা বাদ দিলে, অক্ষয়কুমারকে মোটেই উনিশ শতকের এক ট্র্যাজিক চরিত্র বলা চলে না। বাস্তব জীবনে, ঐহিক সাফল্য তিনি কম লাভ করেননি। তত্ত্ববোধিনী ত্যাগ করে স্বাধীন লেখকবৃত্তিকেই তাঁর পেশা করে নেওয়ার ঘটনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটা কি ঔপনিবেশিক, পারিতোষিক-নির্ভর বঙ্গসমাজে ব্যক্তিমানুষের মূল্য-নির্ভর গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষের পরিচায়ক, যা বিরল বলেই মহার্ঘ? ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে, সরকারি-বেসরকারি ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি থেকে দূরে থেকে, নিজের মতের সঙ্গে আপস না করে, মাথা তুলে বাঁচার এই লড়াইটার জন্যও অক্ষয়কুমার শতবার প্রণম্য। বলা বাহুল্য, তাঁর সামনে উদাহরণ হিসেবে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজ প্রথমবার ছাড়বার সময় অধ্যক্ষ রসময় দত্ত বলেছিলেন, ঈশ্বর যে মেজাজ দেখিয়ে চাকরি ছাড়ছে, ও খাবে কী? উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, আলুপটল বেচে খাব। আলুপটল তিনি বেচেননি, কিন্তু বই লিখেছিলেন, বই ছেপেছিলেন, প্রকাশ করেছিলেন, বিপণন করেছিলেন, লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন। বস্তুত, সমাজ-সংস্কার ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে সে-টাকা অকাতরে ব্যয় না করলে বিদ্যাসাগর সে যুগেই নিযুতপতি হতে পারতেন। অক্ষয়কুমারেরই মতো 'সমকালের জনপ্রিয় বৃত্তিগুলির (বণিকবৃত্তি, দালালবৃত্তি, কুশীদবৃত্তি, ব্যবহারবৃত্তি) কোনোটিই গ্রহণ করেননি' বিদ্যাসাগরও। সামন্ত-মুৎসুদ্দি অর্থব্যবস্থার বাঁধা পথে না হেঁটে, ঝুঁকি-নির্ভর ভ্রূণাকৃতি বুর্জোয়া অর্থব্যবস্থার অনিশ্চিত পথ ধরে আর্থিক সাফল্য লাভ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। এ উদাহরণ নিশ্চয়ই অক্ষয়কুমারকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

**প্রভেদ**

কিন্তু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর একটা মস্ত প্রভেদও ছিল। বিদ্যাসাগর ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোর অনেক কাছাকাছি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ব্রিটিশ প্রশাসনের যত অ-বনিবনাই থাক, উক্ত প্রশাসন তাঁকে খাতির করে চলত। নইলে ঔপনিবেশিক সরকার তাঁকে সি আই ই (কম্প্যানিয়ন অব দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার) পদক দেবে কেন? এই পদক 'গ্রহণে'র ঘটনাটিও অবিকল বিদ্যাসাগরের চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলে। "১৮৮০ সালের ১ জানুয়ারি ভারত-গভর্নমেন্ট বিদ্যাসাগরকে 'সি আই ই' উপাধি দিয়েছে। এ-উপাধি নিতে হবে। রাজভবনে যেতে হবে, দরবারী পোশাকে গিয়ে উপাধি নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সে তো অসম্ভব কথা। বিদ্যাসাগরের পক্ষে অসম্ভব।" কী করলেন বিদ্যাসাগর? উপাধি প্রত্যাখ্যান করলেন? না, তার বদলে অনুষ্ঠানটা এড়ানোর জন্য "দিনকয়েকের জন্য কার্মাটাড়ে চলে গেলেন। উপাধি-বিতরণের পর আবার কলকাতায় ফিরে এলেন।" তখন সরকার থেকে তাঁর বাড়িতেই সেই পদক পাঠিয়ে দেওয়া হল। পদক-বাহী সরকারি চাপরাশি আর কর্মচারি 'কিছু পেয়ে থাকে' শুনে তিনি মন্তব্য করেন, 'এই পদকখানা নিয়ে বাজারে কোনো বেনের দোকানে গিয়ে বেচে দাও। যা পাবে, দু-জনে ভাগ করে নিও।'[২৩] এর পরেও ১৮৮৭ সালে তারা তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দিতে চেয়েছিল। এবার অবশ্য তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর বিদ্যাসাগরি মেজাজ নিয়েই ব্রিটিশ প্রশাসনের বেশ কাছের লোক ছিলেন। এটা তাঁকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিল—এমনকি পাঠ্যপুস্তকের বিপণনেও। অপর দিকে অক্ষয়কুমারের ব্যাপারটা একেবারে আলাদা। আগেই দেখেছি, তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক-পদ ত্যাগ করার পরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরকারি নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ পদে তিনশো টাকা বেতনে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রেরই সুপারিশে। তারপর অসুস্থতার কারণে সে-চাকরি ছাড়ার পর তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে বিদ্যাসাগরেরই উত্থাপিত প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি পঁচিশ টাকা করে মাসোহারা পান। সে সময় তাঁর রোজগারের কোনো বিকল্প পন্থা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোনো আপসের পথ ধরেন নি। ক্রমে তাঁর লেখা *চারুপাঠ* তিন খণ্ড এবং অন্যান্য বইয়ের বিক্রি এতটাই বাড়ে যে তত্ত্ববোধিনীর ভাতা তো তিনি প্রত্যাখ্যান করেনই, উপরন্তু পরিণত বয়সে কলকাতায় ও বালিতে দুটি বাড়ি কেনেন। বালিতে তাঁর 'শোভনোদ্যান' দেখে বিদ্যাসাগর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় বলেছিলেন, এটি হল চারুপাঠ *চতুর্থ* খণ্ড!

সেই শোভনোদ্যানেই প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক কষ্ট পেয়ে, খানিকটা স্ব-আরোপিত সামাজিক ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে মৃত্যু হয় অক্ষয়কুমার দত্তের। বিদ্যাসাগর আরো পাঁচ বছর বেঁচেছিলেন। তিনিও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা বরণ করে নিয়েছিলেন। মা, বাবা, পুত্র, জামাতা, আত্মীয়স্বজন সকলের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্কে চিড় ধরেছিল।[২৪] রক্ষণশীল সমাজ তাঁর কাছ থেকে 'স্বাতন্ত্র্যে শেকুলকাঁটা' হওয়ার মূল্য কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিয়েছিল। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই; যুগ যুগ ধরে মহতেরা এ মূল্য দিয়েই আসছেন।

**উল্লেখপঞ্জি :**


১। *পুরাতন প্রসঙ্গ* (সম্পা নির্মাল্য আচার্য), সুবর্ণরেখা, কলকাতা পৃ: ৩১২।

২। ঐ পৃ: ৩৪২।

৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্যসাধক চরিতমালা*, ১/১২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৯৭৬।

৪। সুকুমার সেন, *বাংলার সাহিত্য-ইতিহাস*, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ১৯৯৩, পৃ: ১৬৭।

৫। বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, পঞ্চম খণ্ড, পাঠভবন, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ: ২৬৬।

৬। জে ডি বার্নাল, *ইতিহাসে বিজ্ঞান* (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী), আনন্দ, কলকাতা, ২০০৫, পৃ: ২৬৯-২৭১।

৭। সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'বিজ্ঞান-পথিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র', *এক্ষণ*, শারদীয় ১৩৯৮।

৮। *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯৯, ২-৫২।

৯। রাজনারায়ণ বসু, *আত্মজীবনী*, (তৎকর্তৃক লিখিত হস্তলিপি হইতে মুদ্রিত), দ্বিতীয় সংস্করণ, সাম্য প্রেস, ৬ কলেজ রো, কলকাতা, ১৯১২ (এ লতিফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত)। পৃ: ৫৪

১০। সিদ্ধার্থ ঘোষ, পূর্বোল্লেখিত।

১১। ঐ, পৃ: ২৬৮-৬৯।

১২। মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি, *বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত*, ১৮৮৫।

১৩। অজিতকুমার চক্রবর্তী, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*, ইন্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ১৯১৬, পৃ: ২৪১।

১৪। বার্নাল, পৃ: ৩২৩।

১৫। *ভা উ স*, পৃ: ২-৫৪।

১৬। ঐ, পৃ: ৪।

১৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *চার্বাকচর্চা*, সদেশ, কলকাতা ২০১০, পৃ: ৮-৯।

১৯। ঐ, পৃ: ৪৯।

২০। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, *অক্ষয়-চরিত*, আদি ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা, ১৮৮৭ (*এক্ষণ*, পৃ: ৬০)।

২১। নকুড় বিশ্বাসের বৃত্তান্তের সঙ্গে এর অমিল রয়েছে। বিশ্বাস লিখেছেন, '... যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের কথা বলিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "তা হলে বাঁচি"।' পাদটীকায় নকুড় বিশ্বাস জানান, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথাগুলি এস্থলে উদ্ধৃত হইল।' (*এক্ষণ*, পৃ: ৬০) যেহেতু মহেন্দ্রনাথের বইটি অক্ষয় দত্তের জীবৎকালেই বেরিয়েছিল, এবং অক্ষয়কুমার নিজে বহুলাংশে তার উপাদান সরবরাহ করেছিলেন, তাই মহেন্দ্রনাথের বিবরণটিই যথার্থ বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে।

২২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৩। ইন্দ্রমিত্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*, আনন্দ, কলকাতা, ২০০১, পৃ: ২৩৮-৩৯।

২৪। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য আশীষ লাহিড়ী, ' "ঘর-জ্বালানে পর-ভালানে" বিদ্যাসাগর' *পরিপ্রশ্ন*, জুলাই ২০১৩।